তারিখ 29 NOV 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 6

বাংলাদেশ সামরিক যাদুঘর

মেজর মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন এ.ই.সি

মিজেকে প্রকাশ করা মানুষের একটি মৌলিক প্রবৃত্তি। ধর্মচর্চা, সাহিত্য, শিল্প, অভিনয়, সংগীত,যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। আত্মপ্রকাশের পর সকল মানুষই চায় আপন সৃষ্টির স্থায়িত্ব। মানুষ নিজেদের সুকীর্তি, সুন্দর সৃষ্টি এবং যা কিছু নিজেদের জন্যে গৌরবের তা ভবিষ্যতের জন্যে রেখে যেতে চায়। চিন্তাজগতের অভিব্যক্তিকে চিরায়ত করে রেখে যাবার বাসনা নিয়েই একদিন মানুষ গড়ে তুলেছিল গ্রন্থাগার। অন্যদিকে মানব সভ্যতার বস্তুগত প্রকাশকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার আকাংখা থেকেই একদিন সৃষ্টি হয়েছিল যাদুঘরের। সভ্যতার ইতিহাস ও জ্ঞান বিকাশের সাথে যাদুঘরের ইতিহাস এবং ক্রমবিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতীতে যাদুঘরের সূচনা হয়েছিল রাজা বাদশা ও সম্রাটদের মাধ্যমে। তারা সংস্কৃতিচর্চা করতেন এবং নিজেদের সৌন্দর্য পিপাসায় তাড়িত হয়ে সুন্দর, মনোরম ও আনন্দদায়ক দ্রব্যসামগ্রী সমহে সংগ্রহ করে সাজিয়ে রাখতেন। কারো কারো ক্ষেত্রে এটা ছিল নিছক গর্ব ও সৌন্দর্যের লালন আবার কেউ চাইতেন অন্দরতম সৃষ্টিগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে যেতে। প্রাথমিক অবস্থায় এ সমস্ত সংগ্রহশালা একান্তভাবেই শাসক শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সেখানে সাধারণ মানুষের কোন প্রবেশাধিকার ছিলো না এ কারণে এগুলোকে যাদুঘর না বলে ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা নামে অভিহিত করাই বাঞ্ছনীয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যাদুঘরে জনগণের প্রবেশাধিকারের গুরুত্ব অনুধাবন করা হয়। লণ্ডনের ট্রেডেসক্যান্ট মিউজিয়ামটি ১৬৮৩ সালের মে মাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করা হয়ও দানকৃত ব্যক্তির নামানুসারে যাদুঘরটিকে আশমোলিয়ান যাদুঘর নামে নামকরণ করা হয়। পরবর্তী জাতীয় যাদুঘর বৃটিশ মিউজিয়াম ১৭৫৯ সালে স্থাপন করা হয়। বৃটিশ উপনিবেশের বিত্তও প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্যবান সামগ্রী সংগ্রহে সাহায্য করেছিল। মধ্যযুগ থেকে কতিপয় ক্রমবিবর্তন, যেমন রেনেসাঁস বা নবজাগরণ, বৃহান বর্ষের বিস্তৃতি, গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদি দেখা দেয়। এ সকল পরিবর্তনের ফলে আধুনিক যাদুঘর সম্পর্কে জনগণের ধারণাও বদলে যায় এবং এটি একটি জাতীয় সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়।

বর্তমান যুগে যাদুঘর সম্পর্কে বলা যায় যে, এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, যুদ্ধভিত্তিক মূল্যসম্বলিত নিদর্শনাদি সংগ্রহ করে সাজিয়ে রাখা হয় এবং এ সমস্ত সযত্নসজ্জিত বস্তুসামগ্রী থেকে যে কোন মানুষ প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করতে পারেন। বই পড়ে কোন বস্তু সম্পর্কে মনের মাঝে উদিত কাল্পনিক চিত্রের মাধ্যমে একটি অস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব, কিন্তু যাদুঘরে রক্ষিত বস্তু সম্পর্কে শিক্ষিত গাইডের ব্যাখ্যা শ্রবণ করে ও সে সাথে বস্তুটিকে দর্শন ও স্পর্শের মাধ্যমে এর সম্বন্ধে আরো অনেক বেশী পরিষ্কার ধারণা লাভ করা সম্ভব। এছাড়া যাদুঘর শুধুমাত্র বস্তুকেই ধরে রাখে না তার কাল বা সময়কেও ধরে রাখতে সক্ষম হয়। অন্য কথায়, যাদুঘর মূল্যবান বস্তুসমূহকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে রেখে দেয় ভবিষ্যৎ বংশধরদের উদ্দেশ্যে।

প্রাথমিক পর্যায়ে একই যাদুঘরে বিভিন্ন প্রকার এবং শ্রেণীর দ্রব্যসামগ্রী বিভিন্ন স্থানে সাজিয়ে রাখা হতো। বর্তমান যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার সাথে সাথে যাদুঘরের ব্যবস্থাপনায়ও বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। এতে অবশ্য সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই আছে। কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠিত যাদুঘরের একজন দর্শক একই স্থানে বিভিন্ন শাখার নিদর্শনাদি পরিদর্শন করতে পারেন। অপর পক্ষে কোন একটি বৃহত্তর শাখা যদি স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলা হয় তাহলে এর বিকাশ ও সমৃদ্ধি অতিদ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং সংশ্লিষ্ট শাখার উৎসাহী ব্যক্তিরা প্রভূত অনুপ্রেরণা লাভ করেন। সামরিক যাদুঘর শুধুমাত্র এই প্রেরণা সম্বলিত প্রচেষ্টারই ফল নয় বরং একটি জাতির সামরিক-সামরিক চেতনাবোধ থেকেই এর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

আমরা জানি মানব সভ্যতার ইতিহাস সংঘর্ষ ও যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমেই আংকের পর্যায়ে এসেছে। গুহাবাসী মানুষও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যে হাতিয়ার তৈরী করেছে। আজকের দিনে হাতিয়ারের রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। এর কার্যকারিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য সেই একই রয়ে গেছে। রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড অডেসির মতো মহাকাব্যে আমরা তৎকালীন বীর যোদ্ধাদের শৌর্য-বীর্য ও বীরগাথার পরিচয় পাই। সেখানে যুদ্ধকৌশল, গোয়েন্দা তৎপরতা, কিংবদন্তী, দুর্গ, সামরিক সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির অনেক চিত্র খুঁজে পাই। সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই মানুষ নিজেদের বীরত্ব ও যুদ্ধ কাহিনী সযত্নে রক্ষণ করে আসছে এবং তা সমগ্র জাতির জন্যে অনুপ্রেরণা ও গর্বের বিষয় হয়ে আছে। বহমান সময়ের স্রোতে সভ্যতা ও ইতিহাসের অনেক কিছুই অস্পষ্ট হয়ে আসে কিংবা একেবারে বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যায়। তাই সভ্যতার সংকটকালে সংঘটিত যুদ্ধবিগ্রহের স্মৃতি-নিদর্শনাদিসমূহকে আগামী দিনের বিশ্ব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে প্রমূর্ত করে তোলার লক্ষ্যে একটি সামরিক যাদুঘরের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

088

উনিশ শতকের প্রারম্ভকাল থেকে এ উপমহাদেশে কয়েকটি যাদুঘর স্থাপিত হয়েছে। এ সকল যাদুঘরে অন্যান্য অনেক জিনিসের সাথে বিভিন্ন সময় কালের হাতিয়ার, শোলা, বর্ম ইত্যাদি বুদ্ধোপকরণ রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের দিকে ভারতের বিভিন্ন সামরিক একাডেমী, কলেজ ও স্কুলসমূহে কতিপয় সামরিক যাদুঘর গড়ে তোলা হয় কিন্তু এগুলো শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব ছাত্রদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের নিমিত্তেই ব্যবহৃত হত। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর দিল্লীর রেড কোর্টে ইন্ডিয়ান ওয়ার মেমোরিয়াল মিউজিয়াম স্থাপিত হয় এবং তা সর্বসাধারণের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। সেখানে রাজা শক্তিগুলোর কাছ থেকে প্রাপ্ত যুদ্ধোপকরণ, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রাক্তন জমিদার, রাজা ও নওয়াবদের ব্যক্তিগত যুদ্ধোপকরণ সংগৃহীত রয়েছে। ১৯১৩ সালে ঢাকা যাদুঘর স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে এটিকে জাতীয় যাদুঘর হিসাবে রূপান্তরিত করা হয়। এই যাদুঘরে আমাদের সামরিক ঐতিহ্য সম্পর্কিত অনেক উপকরণ সংগৃহীত আছে।

আমাদের সামরিক ঐতিহ্য অনেক পুরনো ও সমৃদ্ধশালী। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এদেশের জনগণ বীরত্বের সাথে বৈদেশিক শাসনের শৃংখলকে অস্বীকার করেছে। আমাদের সৈনিকরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সিপাহী যুদ্ধে বৈশ্য বিদ্রোহে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে বাংলার বৈশ্যকরা ঐতিহ্য অর্জন করেছে, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় আমাদের সৈনিকরা স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। ১৯৭১ সালে দখলদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৯ মাস ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে আমাদের যোদ্ধারা যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তা জীবনমরণ। মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়েই আমাদের স্বাধীন জাতিসত্তার বিকাশ ঘটেছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসাবে আমাদের এসব বীরত্ব ও কীর্তিগাথাকে ধরে রাখার জন্য সামরিক যাদুঘরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইতিমধ্যে কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ক্ষুদ্র আকারের দুটি সামরিক যাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে একটি সাম-

(৭-এর পাতায় দেখুন)

সামরিক যাদুঘর

(৫ম পাতার পর)

রিক যাদুঘর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আমরা দীর্ঘদিন ধরে অনুভব করে আসছি। আর থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। আমাদের স্বাধীনতা লাভ বিশ্বের আর দশটি রাষ্ট্রের স্বাভাবিকভাবে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মতো নয়। আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে হয়েছে, আমরা ত্রিশ লক্ষ বাংলাদেশীদের ঐ যুদ্ধে হারিয়েছি। সুতরাং '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে আমাদের মাঝে যে স্বাতন্ত্র্য ও সত্তার উন্মেষ ঘটেছে তাকে টিকিয়ে রাখা আমাদের প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আগামী দিনে আমাদের অনাগত সন্তানরা যাতে তাদের পূর্বপুরুষদের শৌর্য-বীর্য, বীরত্বগাথা এবং সামরিক ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করতে পারে তার ব্যবস্থা করে যাওয়া আমাদের মহান দায়িত্ব। তদুপরি বিজ্ঞান যাদুঘর যেমন বিজ্ঞানের ছাত্র ও উৎসাহী গবেষকদের জন্যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে তেমনি আমাদের সামরিক যাদুঘরও প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানের ছাত্রদের গবেষণা কাজে প্রভূত সহায়তা করবে এ সকল লক্ষ্য সামনে রেখেই বাংলাদেশ সামরিক যাদুঘর প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তাভাবনা করা হয়। যদিও অনেক আগেই স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এ যাদুঘরটি স্থাপিত হতে পারতো এবং আমরা আরও বেশী নিদর্শনাদির সমারোহে তাকে সাজাতে পারতাম। কারণ সময়ের পরিসরে আজ হয়তো অনেক কিছু ধ্বংস কিংবা হারিয়ে গিয়ে থাকবে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল মোহাম্মদ আতিকুর রহমান ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় জাতীয় পর্যায়ে একটি সামরিক যাদুঘর স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ও নির্দেশনায় তখন থেকে এ লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু হয়। গতকাল বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ঢাকার মিরপুর সেনানিবাসে বাংলাদেশ সামরিক যাদুঘরের উদ্বোধন করেন। পরবর্তী সময়ে নতুন ভবন নির্মিত হবার পর স্থানান্তর করা হবে। এ যাদুঘরের জন্য সংগৃহীত দ্রব্য সামগ্রীসমূহকে ৮টি বিভাগে সজ্জিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিভাগগুলো হচ্ছে : (ক) হাতিয়ার ও ক্ষুদ্রাস্ত্র, (খ) সামরিক সরঞ্জাম ও বাদ্যযন্ত্র, (গ) পোশাক-পরিচ্ছদ,মেডেল, ব্যাজ ও পতাকা (ঘ),বিখ্যাত যুদ্ধ ও সামরিক অভিযান,(ঙ) সামরিক ইতিহাস, দলিল দস্তাবেজ এবং স্নায়ুযুদ্ধ, (চ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, (ছ) আজকের বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, (জ) পুরনো কামান ও যানবাহন। প্রত্যেকটি বিভাগেই অতীতকাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সমস্ত পরিবর্তন, সংস্করণ ও উন্নয়ন ঘটেছে তা ক্রমানুসারে সজ্জিত করা হবে। এর ফলে একজন দর্শক বা গবেষক কোন একটি বিভাগে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে কোনও আইটেমের ক্রমাগত উন্নতির একটি ধারাবাহিক পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হবেন। যেমন, হাতিয়ার ও ক্ষুদ্রাস্ত্র শাখায় গিয়ে একজন দর্শক আমলের বন্দুক থেকে শুরু করে আজকের অত্যাধুনিক রাইফেল পর্যন্ত দেখতে পারেন। তেমনিভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভাগে গিয়ে একজন দর্শক স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারবেন। আর এ ব্যাপারে সহায়তা করার জন্যে উপস্থিত থাকবেন যাদুঘরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্টাফরা। সামরিক নিদর্শনাদির সংরক্ষণ করা ও এর মাধ্যমে জনগণকে ঐতিহ্যসচেতন করে তোলার মধ্যেই সামরিক যাদুঘরের সার্থকতা। ভবিষ্যতে এ যাদুঘরের পরিসর আরো বাড়ানো হবে এবং নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সাজ-সরঞ্জামাদিও এর সাথে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা সরকারের হাতে রয়েছে।

আমরা আশা করছি, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সামরিক যাদুঘর বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রসমূহের সামরিক যাদুঘরের পর্যায়ে উন্নীত হবে এবং তা একদিকে জ্ঞানার্জন, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি, আনন্দ লাভ এবং অন্যদিকে জাতীয় চেতনালাভের এক মূল্যবান প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। বর্তমান সরকার, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও সেনাবাহিনী প্রধানের সদিচ্ছার ফলেই এমন একটি ঐতিহ্যবাহী প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। এখন থেকে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক গর্বের সাথে বলতে পারবে আমাদের একটি জাতীয় সামরিক যাদুঘর আছে।